১২

স্বাস্থ্যের অধিকার

মিল্লাত হোসাইন

স্বাস্থের অধিকার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যখাতকে নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের ভূমিকা নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। গুঁড়া দুধের সাথে ক্ষতিকর মেলামাইন মেশানো নিয়ে বছরজুড়ে সরকারের যে লুকোচুরি খেলা এবং সাধারণ জনগণের পক্ষে যে আইনি লড়াই চলেছে সে বিষয়সহ খাদ্যে ভেজাল, বিষাক্ত বর্জ্যবাহী জাহাজের বাংলাদেশে আগমন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এ বছর স্বাস্থ্যখাতে যে বিষয়গুলো উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা গেছে সেগুলো হলো– জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে স্বল্প বরাদ্দ, সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং জনগণকে যথাযথ, প্রয়োজনমাফিক এবং কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি। যথাযথ আইনি সুরক্ষা কাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে বলার মতো একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে 'ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০০৮' পাস করার বিষয়টি। সরকারের যথাযথ হস্তক্ষেপের ব্যর্থতায় জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নানা সঙ্কট। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো– বার্ড ফ্লু মহামারী, মেলামাইনযুক্ত গুঁড়া দুধ, কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব এবং বিষাক্ত বর্জ্যবাহী জাহাজের আগমন ইত্যাদি।

সংবিধান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন এবং বৈষম্যহীনভাবে জনগণের স্বাস্থ্যের

অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা।[১] তদুপরি সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমজিডি) অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, পয়ঃনিষ্কাশনের আওতা বাড়ানো, সুপেয় পানি সরবরাহসহ বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার।[২]

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো

২০০৮-০৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে দাবি করা হয়েছে যে, এমজিডি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।[৩] উদাহরণস্বরূপ– গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে নিরাপদ পানির সরবরাহ এলাকা যথাক্রমে ৮৭ ও ৬০ শতাংশে বিস্তৃত হয়েছে। ২০১০ সালের মধ্যে স্যানিটেশন কভারেজ শতভাগ নিশ্চিত করা হবে। এ পর্যন্ত তা গ্রামাঞ্চলে ৮১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্ত ৩০০টি গ্রামে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আরও ২০০টি গ্রাম এবং পাঁচটি পৌরসভায় আর্সেনিক দূষণমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন করা হচ্ছে।[৪] জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিধিমালা, বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা ইত্যাদি হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।[৫]

প্রজনন হার ও শিশুমৃত্যু হারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি করে বলা হয়– দেশের প্রজনন হার তিনগুণ (বর্তমানে এই হার নারী প্রতি ২.৭ যা ১৯৭১-৭৫ সালে ছিল ৬.৩)[৬] এবং পাঁচ বছরের কম বয়স্ক শিশু মৃত্যুর হার (১৯৯০ থেকে ৫০ ভাগ কমেছে) কমে এসেছে।[৭]

যা হোক, স্বাস্থ্য অধিকার সংরক্ষণে সোচ্চার কর্মীরা এ খাতে সরকারের বরাদ্দ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট

---

১ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫(ক), ১৮ এবং ৩২ (জীবনধারণের অধিকার) অনুচ্ছেদ; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ।

২ তিন বছরের (২০০৮-১১) জন্য ২য় পিআরএসপি, অনুমোদিত হয় ২ অক্টোবর ২০০৮। এখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন এমজিডি অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৩ বাজেট ২০০৮-০৯, অনুচ্ছেদ-৫৬।

৪ বাজেট ২০০৮-০৯, অনুচ্ছেদ-১১৩।

৫ বাজেট ২০০৮-০৯, অনুচ্ছেদ-১৪১।

৬ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে-২০০৭-এর প্রাথমিক রিপোর্ট। 'ফারটিলিটি রেট কামস ডাউন টু ২.৭ ফ্রম ৬.৩ : নিপোর্ট সার্ভে, *দি ডেইলি স্টার*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৭ ইউনিসেফ প্রতিবেদন, 'আনডার-৫ মরটালিটি রেট ফলস বাই ৫০%', *ডি ডেইলি স্টার*, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

অপ্রতুল বলে এখনো সমালোচনা করছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন ও সংস্থাপন ব্যয় মিলে ৫,৮৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে– জনপ্রতি হিসেবে যা বছরে ৩৬৩ টাকারও কম,[৮] যদিও বাজেটে জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সরকার ৩২,৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সাত বছরমেয়াদি একটি কর্মসূচি (হেল্‌থ, নিউট্রিশন অ্যান্ড পপুলেশন সেক্টর প্রোগ্রাম-এইচএনপিএসপি) বাস্তবায়ন করছে।[৯] বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি ২,৭৩২ জন ব্যক্তির জন্য হাসপাতালের একটি শয্যা এবং প্রতি ৩,১২৫ জনের জন্য একজন ডাক্তার আছে।[১০] দেশে বর্তমানে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রযুক্তি কর্মীর (টেকনোলজিস্ট) ঘাটতি আছে যথাক্রমে ৬০,০০০, ২,৮০,০০০ ও ৪,৮০,০০০।[১১]

চিকিৎসায় অবহেলা

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত চিকিৎসায় অবহেলায় ৫২ জনের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছে। এসব মৃত্যুতে সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান তদন্ত করেছে বলে জানা যায়নি। উল্লেখ্য, চিকিৎসকদের অনুমোদন (লাইসেন্স) দানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর গত ৩৫ বছরে ৩৭ হাজারেরও বেশি লাইসেন্স দিলেও এ পর্যন্ত মাত্র একজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।[১২]

ওষুধের মান

জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসা সেবার কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে ওষুধের উৎপাদন, সরবরাহ, মান ও দামের ওপর। দেশে উৎপাদিত ওষুধের মান নিয়ে উদ্বেগজনক খবরাখবর বের হয়েছে পত্রপত্রিকায়। নিম্নমানের ও ভেজাল ওষুধ ব্যাপকভাবে বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্যও যথেষ্ট কার্যকর কোনো ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি।[১৩] দেশে অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি, কবিরাজি ইত্যাদি মিলিয়ে ৮৩৬টি

---

৮ বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০৮ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬১.৩ মিলিয়ন।

৯ *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ১৪০।

১০ বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক, ২০০৭।

১১ *প্রাগুক্ত*।

১২ 'বিএমডিসি পানিস্‌ড অনলি ওয়ান ডক্টর ইন ৩৫ ইয়ারস', *নিউ এজ*, ১৫ মার্চ ২০০৮।

১৩ 'কিছু কোম্পানীর ওষুধে পাওয়া গেছে আটা ময়দা ও ট্যালকম পাউডার', *ইত্তেফাক*, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

কোম্পানির তৈরি করা ওষুধের মান পরীক্ষা করার জন্য আছে মাত্র দুটি ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব।

প্রাণঘাতী রোগের বিস্তার

এ বছর দেশের ৪৫টি জেলায় প্রাণঘাতী রোগ কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে (প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ মানুষ এতে আক্রান্ত হচ্ছে)।[১৪] সরকারের কেনা কালাজ্বর প্রতিষেধক 'মিলটেফোসিন' ক্যাপসুল খেয়ে ময়মনসিংহে সাত রোগীর মৃত্যু হওয়ার ঘটনার পর সরকার ওষুধের মান পরীক্ষার উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত নেদারল্যান্ডের একটি পরীক্ষাগারে ওষুধটি নিম্নমানের বলে প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে আর কোনো তথ্য জানা যায়নি।[১৫]

প্রাণঘাতী ও চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এমন রোগ যেমন ক্যান্সার ও এইডস রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান দেশে ১৩-১৫ লাখ ক্যান্সারের রোগী আছে এবং প্রতিবছর অন্তত দু'লাখ করে বাড়ছে।[১৬] দেশে এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১২০৭ জন, যাদের ৩৬৫ জন এইডস রোগী। এদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হচ্ছে শিশু।[১৭] এ পর্যন্ত ১২৩ জন এইডস রোগী মারা গেছে।[১৮] বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান (পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ও মায়ানমারে এইডস আক্রান্তের হার অনেক বেশি) এবং সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীর (ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজার) সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে এখন এইডস মহামারী আকারে ছড়ানোর ঝুঁকির মধ্যে আছে। কিন্তু এই ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। সরকার দেশের সব স্থানে এ রোগের চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে যেতে পারেনি। ফলে চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং সবাই চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে না।

চিকিৎসাখাতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৩১ অক্টোবর ২০০৮ রোগীদের এবং পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গঠন করে

---

১৪ 'গভ. কনসার্ন অ্যাজ কালাজ্বর স্প্রেডস টু ৪৫ ডিস্ট্রিক্টস', *নিউ এজ*, ১৩ অক্টোবর ২০০৮।

১৫ 'কালাজ্বর ওষুধ কেলেঙ্কারি নিয়ে সরকার তদন্ত করছে', *সমকাল*, ১১ অক্টোবর ২০০৮। খবরে বলা হয়, সরকার প্রায় ৪.৫ কোটি টাকার ওষুধ নিয়েছে একটি ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি থেকে।

১৬ বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউন্ডেশন, 'ক্যান্সার অ্যাটাকস অ্যাবাউট ২ লাখ পিপল অ্যানুয়ালি ইন কান্ট্রি', *নিউ এজ*, ১৬ মার্চ ২০০৮।

১৭ আইরীন নিয়াজী মান্না, 'এইডস আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়ছে', *সমকাল*, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১৮ *প্রাগুক্ত*।

'পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন কমিটি'।[১৯] এই কমিটির প্রতিবেদনে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও রোগীদের ভোগান্তির জন্য এক শ্রেণীর চিকিৎসক ও কর্মচারীকে দায়ী করা হয় এবং ১০৪ জনের বিরুদ্ধে বদলিসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়।[২০] এই অবস্থায় দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের মাঠ পর্যায়ের চিত্র এবং সরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে খোদ সরকারই উদ্বিগ্ন।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি

খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি (হালনাগাদ) ২০০৮, জনগণের মধ্যে তীব্র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। কারণ, এই নীতিতে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা আরো সঙ্কুচিত এবং স্বাস্থ্যখাতের ওপর সরকারের নজরদারি কমানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ৩৪২টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ১৩০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার) এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন।[২১] সরকারি হাসপাতালগুলোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে *স্বায়ত্তশাসিত হাসপাতাল অধ্যাদেশ* নামক একটি খসড়া আইন সরকারের বিবেচনায় আছে। এই খসড়া অনুযায়ী, একটি পাইলট প্রজেক্টের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ছয়টি জেলা ও ১৫টি উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে।[২২] কেবল ভিজিএফ (ভারনাবিলিটি গ্রুপ ফিডিং), বয়স্ক ও বিধবা কার্ডধারী, চরম দরিদ্র দুস্থ এবং মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া কেউ বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পাবে না। সচেতন জনগণ, নাগরিক সমাজ ও স্বাস্থ্য অধিকার কর্মীদের সমালোচনা ও বিরোধিতার মুখে *জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০৮* ও *স্বায়ত্তশাসিত হাসপাতাল অধ্যাদেশ* কোনোটাই এখনো পর্যন্ত পাস হয়নি।

বিষাক্ত বর্জ্যবাহী জাহাজ

হাইকোর্ট ৩০ নভেম্বর ২০০৮ পরিবেশবাদী সংগঠন 'গ্রিনপিস'-এর কালো তালিকাভুক্ত জাহাজ 'এমটি এন্টারপ্রাইজ' কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরিবেশ মন্ত্রণালয় জাহাজ কাটার বিষয়ে অনাপত্তিপত্র দিলে বাংলাদেশ

---

১৯ 'সরকারি হাসপাতালের সেবার মান নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকার', *প্রথম আলো,* ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮।
২০ *প্রাগুক্ত।*
২১ বাজেট ২০০৮-০৯, অনুচ্ছেদ-১৪২।
২২ 'গভ. প্ল্যানস অটোনমি অব পাবলিক হসপিটালস', *নিউ এজ,* ১৬ মার্চ ২০০৮।

পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) জনস্বার্থে জাহাজ কাটার বিরুদ্ধে রিট আবেদনটি দাখিল করে।

গুঁড়া দুধে মেলামাইন

আমদানি করা মেলামাইন মিশ্রিত গুঁড়া দুধ পান করে শিশুর মৃত্যু এবং কয়েক হাজার শিশু অসুস্থ হয়ে পড়লে পৃথিবীময় তোলপাড় শুরু হয়। বাংলাদেশও এই প্রতিবাদে শামিল হয়। বাজারে মেলামাইন মিশ্রিত গুঁড়া দুধ প্রতিরোধে ও নজরদারির বিষয়ে সরকারের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না থাকায় জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। পরে সরকার জনগণের চাপে আটটি ব্র্যান্ডের গুঁড়া দুধে (*ডিপ্লোমা, রেডকাউ, ডানো, ইয়াশলি-১, ইয়াশলি-২, সুইট বেবি-২, নিডো এবং অ্যানলিন*) মেলামাইনের উপস্থিতি পরীক্ষা করে। সরকার তিনটি পরীক্ষাগার থেকে তিন ধরনের ভিন্ন ফল পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের পরীক্ষায় আটটি ব্র্যান্ডেই মেলামাইন পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) ও বেসরকারি পরীক্ষাগার 'প্লাজমা প্লাস' শুধু একটি ব্র্যান্ডে (ইয়াশলি-১) মেলামাইনের উপস্থিতি পায়। এই অবস্থায় সরকার পুনরায় পরীক্ষার জন্য আটটি ব্র্যান্ডের নমুনা বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহায়তায় ব্যাংককের একটি গবেষণাগার এবং বাংলাদেশের আণবিক শক্তি কমিশন ও বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চে (বিসিএসআইআর) পাঠায়। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার তাৎক্ষণিক কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় ২৩ অক্টোবর ২০০৮ হাইকোর্ট এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে উক্ত পরীক্ষার ফলাফল না আসা পর্যন্ত এই আট ব্র্যান্ডের গুঁড়া দুধের বিক্রি ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং চার সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি রুল জারি করেন।[২৩]

৩ নভেম্বর তিনটি প্রতিবেদন হাতে আসার পর ব্যাংককের গবেষণাগারের ফলাফলের ভিত্তিতে *ইয়াশলি-১, ইয়াশলি-২, সুইট বেবি-১* এই তিনটি ব্র্যান্ডকে নিষিদ্ধ করে।[২৪] অবশিষ্ট পাঁচটি ব্র্যান্ডের দুধ এখন বাজারে পর্যাপ্ত।

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজাল মেশানোর বিষয়টিও সমানভাবে পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০০৮-এ বিশেষভাবে

---

২৩ 'ব্যান স্ল্যাপড অন ৮ ব্র্যান্ডস : এইচসি অর্ডার টু স্টপ সেল, ডিসপ্লে অব মিল্ক পাওডার টিল টেস্ট রেজাল্ট ফ্রম অ্যাব্রোড কাম', *দি ডেইলি স্টার*, ২৪ অক্টোবর ২০০৮।

২৪ 'তিন ব্র্যান্ডের দুধে ক্ষতিকর মেলামিন', *প্রথম আলো*, ৪ নভেম্বর ২০০৮।

এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[২৫] অধ্যাদেশে ভেজালের প্রতিকার করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিক্রিযোগ্য পণ্যমূল্যের নির্ধারিত তালিকা প্রদর্শন না করা, নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম রাখা, মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেখিয়ে ভোক্তাদের ঠকানো ইত্যাদিকে এ আইনে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[২৬]

২০০৮ সালে ভেজালবিরোধী অভিযান ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এর একটা কারণ হলো বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ। যদিও জনগণকে কার্যকর প্রতিকার প্রদানের উদ্দেশ্যেই বিচার বিভাগ পৃথক হয় কিন্তু এর ফলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্বে সব ম্যাজিস্ট্রেটই ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালিত করতেন। পৃথক্‌করণের পর তারা এই দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন।

২৫ 'ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদিত', *ইনকিলাব*, ২১ আগস্ট ২০০৮।

২৬ *প্রাগুক্ত*।